Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 228 – 235
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

খন পালাগান : উত্তরবঙ্গের অনন্য লোকনাট্য

অরিজিৎ পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : palarijit209@gmail.com

Keyword
খন পালাগান, উত্তরবঙ্গ, দিনাজপুর, রাজবংশী, লোকনাট্য, শাস্ত্রীয় খন, খিসা খন।

Abstract
আলোচ্য প্রবন্ধে উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ লোকনাট্য খন পালাগান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। খন পালাগান প্রকৃত অর্থে এক ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ লোকনাট্য। এটি উত্তরবঙ্গের এক চিরায়ত লোকসাংস্কৃতিক আঙ্গিক। মানুষের সমাজ সভ্যতার বিকাশে যে কৃষিসম্পর্ক, তার উর্বরতা শক্তি এবং তাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত যে আচার-অনুষ্ঠান, সেগুলির মধ্যে কিছু আনন্দঘন পরিবেশ খুঁজে পাওয়া যায়। এই পরিবেশগুলির মধ্যে নাট্যগুণ থাকে, যেগুলিকে কৃষিজীবী মানুষেরা লোকনাট্য রূপে পরিবেশন করেন। খন পালাগান এ ধরনেরই এক লোকসাংস্কৃতিক সংরূপ। খন পালাগানে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের হৃদয়ের আকুতি ফুটে ওঠে। অন্যদিকে তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াই ও সংগ্রামের কাহিনী, আচার, রীতিনীতি, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ও এই পালাগানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কৃষিভিত্তিক সমাজের ‘ফার্টিলিটি কাল্ট’ থেকে লোকায়ত সমাজে উৎসব-আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রয়োগ হয়ে থাকে। সেই সব আচারগত কার্য করতে গিয়েই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের ভাবনায় একটি নাট্যের রূপ চলে আসে, যা পরিণতি পায় খন পালাগানে। রাজবংশী সমাজের খণ্ড খণ্ড জীবনের এক-একটি কোলাজই হল খন পালাগান। এই প্রবন্ধে খন পালাগানের নামকরণ, ইতিহাস, উপস্থাপনা এবং খন পালাগানের প্রকারভেদ শাস্ত্রীয় খন ও খিসা খন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Discussion
প্রাককথন : মানব জীবনের প্রতি পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে যে সমস্ত উপাদানগুলি, পরম্পরায় আবহমানকাল ধরে টিকে রয়েছে— তার সমস্ত কিছুই লোকসংস্কৃতির উপাদান। শুধুমাত্র নৃত্য-গীত-বাদ্য-নাটকই নয়, এগুলির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সমাজ জীবন, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস থেকে বার্ষিক পূজাপার্বণ, আচার — সবই লোকসংস্কৃতির বন্ধনীতে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের লোকসাংস্কৃতিক সংরূপ। এগুলির শিকড় রয়েছে গ্রাম বাংলার মাটিতে। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য, মালদহের গম্ভীরা, মুর্শিদাবাদের আলকাপ, বীরভূমের ভাদু, টুসু গান ও রায়বেঁশে নৃত্য, সুন্দরবনের বনবিবির পালা প্রমুখ নানা ধরনের লোকসাংস্কৃতিক সংরূপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। এগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গের অপর একটি লোক সাংস্কৃতিক সংরূপ হল

'খন' পালাগান, যা বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতির এক সুপ্রাচীন সংরূপ। এই পালাগান প্রায় চর্যাপদের সমসাময়িক। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় (দেশভাগোত্তরকালে পশ্চিম দিনাজপুর, পরবর্তীকালে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক কারণে দ্বিধাবিভক্ত উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা) এবং দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও মালদহ জেলার কিছু অংশের গ্রামাঞ্চলে খন পালাগান অধিক প্রচলিত।

খন পালাগানের নামকরণ :

উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ লোকনাট্য তথা উত্তরবঙ্গের লোকদর্পণ খন পালাগান গ্রাম বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য। 'খন' শব্দটি স্থানীয় সাধারণ জনমানসে বিবিধ তাৎপর্য্যে গৃহীত হয়ে থাকে। প্রয়াত খনশিল্পী মাধাই মহন্তের মতো অনেকেই মনে করে থাকেন 'খন' শব্দটি এসেছে খনার বচন থেকে। খনা দেবীর বচন যেমন অভ্রান্ত সত্য হিসাবে পরিগণিত হয়, তেমনি খন পালাগানের বিষয়গুলিও বাস্তব সামাজিক সত্যকে তুলে ধরে। অন্যদিকে, প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতি গবেষক পুষ্পজিৎ রায়ের মতে, 'খনন' থেকে 'খন' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।[১] 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টি হয় হৃদয় খনন করে' — মূলত এই ধারণাকে অবলম্বন করেই তিনি 'খন' শব্দটির উদ্ভবের ইতিহাস নির্ণয় করেছেন। আবার প্রখ্যাত খন পালাকার খুশী সরকারের মতে, 'খন' শব্দটি এসেছে 'এখন' শব্দটি থেকে। তাঁর মতে, বর্তমান সময়ের নানা ঘটনার খতিয়ানই খন পালাগানের মূল উপজীব্য। অনেকে আবার মনে করেন, 'সময়' বা 'খণ্ড'বা 'প্রহর' অর্থেও 'খন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রেও ইঙ্গিত করা হয় সমকালীন বাস্তব সময় অর্থাৎ 'এইক্ষণ' এর প্রতি। নবান্নের সময় ক্ষেতের নতুন ফসল ঘরে তোলার পরই গ্রামের জমিদার বাড়িতে বা অন্য কোনও স্থানে খন পালাগানগুলি অনুষ্ঠিত হয়, সেই দিক থেকে মালদহ জেলার বরিন্দ এলাকার গাজোল, হবিবপুর প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে 'নতুন ফসল' অর্থেও 'খন' শব্দটি প্রচলিত। জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অঞ্চলে 'কৃষিক্ষেত্র' অর্থেও 'খন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আবার অনেকে মনে করেন, যেহেতু স্থানীয় সত্য ঘটনাই খন পালাগানের বিষয়গত অবলম্বন, তাই 'ঘটনা' অর্থেও 'কাণ্ড' শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে 'খন' শব্দটি এসেছে (কাণ্ড>খণ্ড>খন)[২]।

খন পালাগানের ইতিহাস :

খনের প্রচলন কবে থেকে তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও প্রখ্যাত খন পালাকার খুশী সরকারের মতে, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকেই খন পালাগানের প্রচলন ছিল। এই পালাগান মূলত উত্তরবঙ্গের কৃষিজীবী রাজবংশী, দেশি ও পলি সম্প্রদায়ের মানুষজনেরই সৃষ্টি। অবিভক্ত দিনাজপুরের বেরোল থানা অঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ খন পালাগান অভিনয় করতেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ খন পালাগানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পূর্বের রীতি অনুসারে বর্তমানে ভাদ্র মাসের পর আশ্বিন-কার্তিক মাসে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষেরা খন পালাগান বাঁধেন ও অনুশীলন করেন। এই সময়টা তাঁদের কাছে অবসরের সময়। তাই বলা যায়, খন পালাগান তৈরি হয় উৎসবের ঋতুতে। ভাদ্র মাসে শ্রী শ্রী জীমূতবাহন পূজা বা জিতাষ্টমী পূজার শুভ লগ্নে খন পালাকারেরা খন পালা লেখা শুরু করেন। অনেক খন পালাকার সেই দিন ঘট বসান এবং অনেক খন পালাকার গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে দলবদ্ধ হয়ে বসে খন পালাগানের বিষয়বস্তু ঠিক করেন। এক-একটি খন পালাগান বাঁধতে মাসাধিক কাল পর্যন্ত সময় লেগে যায়। শীতকালে খন পালাগানের অভিনয় সব চেয়ে বেশি হয়। কোনও কোনও জায়গায় আবার কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন থেকে খন পালাগানের উৎসব শুরু হয়। তিনদিন ধরে এই উৎসব চলে। কালীপূজার সময়ও খন পালাগান অনুষ্ঠিত হয়[৩]।

খন পালাগানে নাটকীয়তা ও সঙ্গীতময়তার সুষম সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কথ্য সংলাপ এবং সঙ্গীতময় সংলাপের মিশ্রণেই খন পালাগানের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বাক্য বিনিময় করে থাকেন। খনের সঙ্গীতগুলির মধ্যে এক ধরনের সুরমূর্ছনা থাকে, যা দর্শকদের আকৃষ্ট করে। খন পালাগানের সুর, তাল ও ছন্দ এক বিশেষ রসবোধ ও উপলব্ধির বিষয় হয়ে উঠেছে দর্শক ও গবেষকদের কাছে। স্থায়ী ও অন্তরা মিলিয়ে মোট চারটি পংক্তি থাকে খন পালার গানগুলিতে।

সঙ্গীতগুলিই খন পালাগানের মূল উপজীব্য। খন পালাগানের কোনও নির্দিষ্ট সুর, তাল বা স্বরলিপি নেই[৪]। খন পালাগানের গানগুলির একটিই সুর, তা হল খন সুর। সাধারণত রাজবংশী ভাষাতেই খন পালাগান লিখিত ও অভিনীত হয়ে থাকে।

গ্রামের সাধারণ মানুষের নবান্ন উৎসব পালনের সঙ্গে খন পালাগানের সম্পর্ক রয়েছে। দেশভাগের পূর্বে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় মূলত জমিদারি সংস্কৃতি প্রচলিত ছিল। খন পালাগান সেই সময়ে জমিদারি সংস্কৃতির বাইরে দিনাজপুরের লোক দর্পণ হয়ে উঠেছিল। এই পালাগান ছিল জনতার সংস্কৃতি, জনগণের সংস্কৃতি। নবান্ন পূজার পর গ্রামের প্রধান বা সমাজপতিদের নির্ধারিত কোনও একটি দিনে গ্রামবাসীরা সম্মিলিত হতো আনন্দ-উৎসবে। গোষ্ঠীভোজনের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মতামত গ্রহণ করে আমোদ ও মনোরঞ্জনের জন্য ওই দিন সন্ধ্যাবেলা খন পালাগান বা স্থানীয় কোনও লোকগীতির আসর বসানো হতো। পূর্বে এভাবেই খন পালাগানের আয়োজন করা হতো। আগেকার দিনে আমন্ত্রিত খন পালাগানের দলগুলির কুশীলবদের আর্থিক আয় খুব বেশি ছিল না, শিল্পীদের সম্মানার্থে 'খোল তালের মান' রাখতে নিয়মরক্ষার জন্য যৎসামান্য অর্থ প্রদান করা হতো। খন পালাগানের দলের সদস্যরাও গ্রামবাসীদের সাথে মিলেমিশে পংক্তিভোজনে বসতেন এবং তাদের মতোই নবান্ন উৎসবে বলি দেওয়া খাসির মাংসের ভাগ পেতেন। এছাড়াও খনশিল্পীদের সর্ষের তেল দিয়ে মাখা মুড়ি, পেঁয়াজ ও এক প্যাকেট করে বিড়ি প্রদান করা হতো। এই সবটাই ছিল অ-ব্যবসায়িক। মাঝে মাঝে দিনাজপুরের অভিজাত জমিদার পরিবারগুলির আমন্ত্রণে তাদের বাড়িতে খন পালাগানের আসর বসলেও একথা মনে রাখতে হবে, খন পালাগান কখনই অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্ট শিল্প ছিল না, তা ছিল গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষদের শিল্পবোধ দ্বারা প্রচারিত শিল্প।

পূর্বে এক-একটি খন পালা দীর্ঘসময় ধরে অনুষ্ঠিত হত। আসলে নবান্নের সময় নির্দিষ্ট কোনও গ্রামে খন পালাগানের আসর বসার খবর পেয়ে আশেপাশের বহু গ্রাম থেকে অনেক মানুষ সপরিবারে এসে সমবেত হতেন সেখানে। খন পালাগানের অভিনয়ও শুরু হত সন্ধ্যা পেরিয়ে। গভীর রাতে পালাগানের আসর সমাপ্ত হলে দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষদের পক্ষে সপরিবারে স্ব-স্ব গ্রামে ফিরে যাওয়া অসুবিধাজনক ছিল। তাই দর্শকদের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে খনশিল্পীরা খন পালাগানগুলির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে সারারাতব্যপী খন পালাগানের অভিনয় করতে শুরু করেন। ভোর অবধি খন পালাগানের অভিনয় দেখে দর্শকেরা বাড়ি ফিরতেন। একাধারে সঙ্গীত সংযোজন, অন্যদিকে সংলাপের পুনরুক্তির মাধ্যমেই পালাগুলিকে দীর্ঘায়িত করা হতো। এক-একটি খন পালাগান প্রায় সাত-আট ঘণ্টা ধরে অভিনীত হতো। এক অদ্ভুত ধরনের স্থিতিস্থাপকতা খন পালাগানগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সঙ্গীত-সংলাপ সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে খন পালাগানগুলিকে বড় বা ছোট করে নেওয়া যায়। তবে বর্তমানে সময়ের অপ্রতুলতার কারণে কোনও দর্শকই দীর্ঘ সময় ধরে খন পালাগান দেখতে চান না, ফলে আধুনিক যুগের দর্শকদের জন্য বর্তমানে খনশিল্পীরা খন পালাগানগুলি থেকে কিছু সঙ্গীত ও সংলাপ বিয়োজন করে খন পালাগানগুলি পরিবেশন করছেন। পূর্বে যে খন পালাগানগুলি সারারাতব্যপী সাত-আট ঘণ্টা ধরে অনুষ্ঠিত হতো, তা কমতে কমতে বর্তমানে কখনও আড়াই ঘন্টা থেকে তিন ঘণ্টা, কখনও বা একেবারেই স্বল্প সময়ে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে পরিবেশিত হচ্ছে।

খন পালাগানের উপস্থাপনা :

অপরাপর লোকনাট্যের মতো খন পালাগানের আসরও অনুষ্ঠিত হয় কোনও গৃহস্থের অঙ্গনে উপরে শামিয়ানা খাটিয়ে ও নীচে 'ধোকরা' (চট জাতীয় বস্তু) বিছিয়ে। আসরের ঠিক মাঝখানে বসে 'বাজনা পার্টি', 'দয়হার পার্টি' ও ঐকতান বাদক। দর্শকেরা আসরের চারদিকে গোল হয়ে ঘিরে বসেন। দর্শক ও বাদ্যশিল্পীদের মাঝের বৃত্তাকার স্থানে খন পালাগানের কুশীলবেরা অভিনয় ও নাচ-গান করেন। খন পালাগানের মূল গায়েনকে 'গীদাল' নামে অভিহিত করা হয়। মূল গায়েন ও বাদ্যশিল্পী 'দয়হার পার্টি'-র সঙ্গেই বসেন। আসর-বন্দনার মাধ্যমে খন পালাগানের সূচনা হয়। যাঁরা বন্দনা গান করেন, তাঁরা অনেক সময় হাতে একটি করে ধূপকাঠি নিয়ে দাঁড়ান। পূর্বদিকে ধর্মঠাকুরের, পশ্চিম দিকে পীরসাহেবের, উত্তরদিকে দুর্গাদেবীর, দক্ষিণে গঙ্গাদেবীর ও সবশেষে 'দশঠাকুর' অর্থাৎ 'জনগণের' বন্দনা করা হয়।

মূলত চারজন খন শিল্পী আসর বন্দনা করেন। ধূপের বদলে অনেক সময় তাঁরা হাতে প্রদীপ নিয়েও বন্দনা গান করেন। বন্দনায় সবাইকে খন পালা গানের আসরে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়[৫]।

খন কুশীলবদের সাজপোশাক খুবই সাধারণ হয়। অভিনেতারা ধুতি-শার্ট পরেন, মুখে পাউডার ও আলতা সহযোগে সুন্দর করে সাজেন। তাঁরা অনেক সময় চোখে চশমা ব্যবহার করেন। পালার অভিনেত্রীরা শাড়ী পরেন, মাথার লম্বা চুলে সুন্দর করে খোঁপা বাঁধেন, খোঁপাতে অনেক সময় ফুলও ব্যবহার করেন। তাঁরা কানে দুল বা মাকড়ি পরেন, গলায় মালা পরেন, গালে তারা চিহ্ন আঁকেন, ঠোঁটে আলতা মাখেন, হাতে চুড়ি ও পায়ে নুপূর পরেন। খন পালাগানে পূর্বে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো কাড়া নাকাড়া, পরবর্তীকালে খোল, করতাল, ঢোল, বাঁশের বাঁশি, আঠাশ রিডের হারমোনিয়াম প্রমুখ বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন হয় খন পালাগানে।

খন পালাগানের প্রকারভেদ— শাস্ত্রীয় খন ও খিসা খন :

খন পালাগানের মূলত দুটি প্রকারভেদ রয়েছে। প্রথমটি হল শাস্ত্রীয় খন পালাগান, যা স্থানীয় ভাষায় 'শাস্তোরিও খন' বা 'শাস্তোরি খন' নামে পরিচিত। এই খন পালাগানগুলি মূলত শাস্ত্রনির্ভর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। পালাগানগুলি মূলত যোগশাস্ত্র ও দেহশাস্ত্র বিষয়ক। এই শাস্ত্রীয় পালাগানগুলিই খনের প্রাচীনতম রূপ। শাস্ত্রীয় খন পালাগানগুলির নায়িকাকে 'শোরী' বলা হয়। প্রয়াত খনশিল্পী মাধাই মহন্তর মতে 'তত্ত্বরসামৃত জ্ঞানমঞ্জরী'-তে শ্রীরাধিকাকে 'বৃষভানুসূতাং বৃন্দাবনেশ্বরী' বলে অভিহিত করা হয়েছে, 'শোরী' শব্দটি সেই 'ঈশ্বরী' শব্দের অপভ্রংশ থেকে এসেছে।

প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ধনঞ্জয় রায় মনে করেন, খন পালাগান উৎপত্তিলাভ করেছিল চর্যাপদের সময়কালে। অর্থাৎ চর্যাপদের সমসাময়িক এই খন পালাগানের উদ্ভবের কাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। তবে সেই সময়ে খন পালাগান কেমন ছিল, তাঁর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। খন পালাগান বর্তমানে যে রূপে পরিবেশিত হয়, তার উদ্ভব আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর পূর্বে। সেই সময় শাস্ত্রীয় খন পালাগানই অধিক প্রচলিত ছিল। সেই সময় যে সমস্ত শাস্ত্রীয় খন পালা গান প্রচলিত ছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'ব্রহ্মশোরী (কথ্য ভাষায় 'বর্মশোরী'), 'বৈষ্টম বাউদিয়া নয়নশোরী' ইত্যাদি।

রাজবংশীরা মূলত কৃষ্ণভক্ত, রাজবংশী সম্প্রদায়ে প্রায় সব পরিবারেই কুলগুরু বর্তমান। একজন গোঁসাই ও একজন সাধারণ নারীর শাস্ত্রবিষয়ক তর্কবিতর্কই 'বৈষ্টম বাউদিয়া নয়নশোরী' পালার মূল বিষয়বস্তু। একজন গোঁসাই শিষ্যবাড়িতে গেলে শিষ্যটির বিধবা কন্যা গুরুর সেবা করতে গেলে গুরু তাঁর হাতে সেবা গ্রহণ করেন না, কারণ সেই মেয়েটি গুরুমন্ত্র গ্রহণ করেনি— তাই সে অশুদ্ধ। তখন সেই মেয়েটি গুরুকে প্রশ্ন করে—

"শুন বষ্টম-গঁসাই
চান্দে মাসে নারী শুদ্ধ
জমিন শুদ্ধ হয় চাষে
হাণ্ডি ভাঙ্গলে খুলা শুদ্ধ
পুরুষ শুদ্ধ হয় কীসে
কই বষ্টম গঁসাই..."

একজন সাধারণ নারীর শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞান দেখে গোঁসাই হতবাক হয়ে যান। পরবর্তীকালে তাঁদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে দিয়ে পালাটি শেষ হয়। 'বর্মশোরী' পালার মূল কাহিনী হল রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন ও তাঁর পছন্দের জীবনসঙ্গিনী খুঁজে নেওয়ার কাহিনী। রাজবংশী সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক (গুরু গোঁসাই) ধর্মগুরু ও শিক্ষাগুরুর দ্বন্দ্বে এই পালাটি শুরু হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ধর্মের পক্ষ নেন, যদিও পালাটি রামকেলির ঘটনাটিকে সমর্থন করে না। রূপকের আড়ালে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই পালায়।

শাস্ত্রীয় খন প্রসঙ্গে প্রখ্যাত খন পালাকার খুশী সরকার মনে করেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গে ইসলামী ধর্মান্তরকরণ চলছিল পুরোদমে, সেই সময় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছিল বাংলার মাটিতে।

তিনি দলিত-আদিবাসী সকল সম্প্রদায়ের মানুষকেই হরিনাম করার সুযোগ দিয়েছিলেন। সেজন্যই চৈতন্য পরবর্তী সময়ে অনেক শাস্ত্রীয় খন পালাগানের মূল বিষয় হয়ে উঠেছিল শ্রীচৈতন্যের ধর্মপ্রচার তথা মানবধর্মের জয়গানের বিষয়টি। এছাড়া তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষের যাবতীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে রামায়ণ-মহাভারত থেকে রামায়ণ মহাভারতের নানা কাহিনী নিয়ে, ভাগবত পুরাণের কংসবধের কাহিনী নিয়ে পূর্বে বহু শাস্ত্রীয় খন পালাগান রচিত হয়েছে এবং পরিবেশিত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে শাস্ত্রীয় খন পালাগানের ধারাটি কমে আসতে থাকে, সেইস্থানে বেশি পরিমাণে প্রচলিত হয়ে পড়ে নতুন এক ধরনের খিসা খন পালাগানের ধারা। এই খন পালাগানগুলি মূলত স্থানীয় কেচ্ছা-কাহিনী নিয়ে পরিবেশিত হয়। সম্ভবত আরবি শব্দ 'কিসসা' থেকেই 'খিসা' নামটি এসেছে। লোকজীবনের অবৈধ প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসাই খিসা খন পালাগানের মূল আলোচ্য বিষয়। খিসা খন পালাগানের নায়িকাদের 'সোরী' বলে অভিহিত করা হয়। এর বানান ও অর্থ উভয়ই শাস্ত্রীয় খন পালাগানের নায়িকার থেকে পৃথক। 'সোরী' বলতে সমাজজীবনের মূল স্রোত থেকে বিপথে সরে যাওয়া কলঙ্কিত নায়িকাকে বোঝানো হয়। নায়ককে বলা হয় 'বাউদিয়া', যার অর্থ 'হিসাব না মানা প্রেমিক'।

শাস্ত্রীয় খন পালাগানের ধারাটি কেন কমে আসতে লাগল? এ প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতিবিদ পুষ্পজিৎ রায় মনে করেন, রাজবংশীরা বৈষ্ণব ও কৃষ্ণভক্ত হলেও পৌরাণিক নানা প্রশ্নোত্তর, গূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব নিয়ে খন পালাগান লেখার জন্য যে প্রস্তুতি প্রয়োজন, তার অভাব ছিল তাদের মধ্যে। নিরক্ষরতাও এর অন্যতম প্রধান কারণ। তাই শাস্ত্রীয় খন পালাগান ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল। দর্শকদের অনাগ্রহই মূলত শাস্ত্রীয় খন পালাগান কমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। শাস্ত্রীয় খন পালাগান ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকলে তার জায়গা গ্রহণ করল খিসা খন পালাগান। নিরক্ষর রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষরা সহজ-সরল আড়ম্বরহীন মনের আবেগে খিসা খন পালাগান তৈরি করতে শুরু করে। প্রখ্যাত খন পালাকার খুশী সরকারের মতে, অসামাজিক কর্ম, মানুষের উপর অত্যাচার, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, অসামাজিক প্রেম-পিরিতি, 'ছণ্ডা-ছুণ্ডির' ('ছোকরা-ছুকরি' অর্থাৎ কমবয়সী যুবক-যুবতী) প্রেম-পিরিতি ইত্যাদি খিসা খন পালাগানের মূল আলোচ্য বিষয়। সারাদিন মাঠে পরিশ্রমের পর কৃষকদের বিনোদনের উদ্দেশ্যে তৈরি হত খিসা খন পালাগান, তাই এর মূল বিষয় ছিল হালকা বিষয়ের কোনও ঘটনা, যেমন—সামাজিক অনাচার বা পরকীয়া ইত্যাদি।

খিসা খন পালাগান উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় এবং বৈচিত্র্যময় লোকনাট্য। দিনাজপুরের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের দেখা, সমাজে ঘটে যাওয়া সত্য ও চর্চিত ঘটনাগুলিকে মনের মধ্যে নাট্যরূপ দিতেন এবং এগুলিই পরিবেশিত হয় খিসা খন পালাগান হিসাবে। 'বাউদিয়া' শ্রেণির (যাদের মধ্যে 'রসকলি বোধ' বা 'রসিক বোধ' ছিল) মানুষেরা তাঁদের 'তৃতীয় নয়ন' দিয়ে সমাজে ঘটে যাওয়া সত্য প্রেমকেন্দ্রিক ঘটনা গুলিকে নিজেদের মনের মধ্যেই নাট্যরূপ দিতেন ও সুরারোপ করতেন, যা পরে খিসা খন পালাগান নামে পরিচিত হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত লোকনাট্যের আঙ্গিকেই এই খিসা খন পালাগান পরিবেশিত হয়।

খিসা খন পালাগানের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন ও জনপ্রিয় পালাগান 'মায়াবন্ধকী'। বহু পুরনো এই পালাটির পালাকারের নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। 'মায়াবন্ধকী' পালাটি রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী অনুসারে রচিত হয়েছিল। রাজা হরিশচন্দ্র যেমন তাঁর স্ত্রী শৈব্যাকে কালু ডোমের কাছে বিক্রয় করেছিলেন, তেমনি এই পালার মূল চরিত্র কিরণকে কিরণের স্বামীও ধনী ব্যক্তির কাছে বন্ধক রেখেছিল গুরুসেবার অর্থ জোগাড় করার জন্য। অবুঝ কিরণকে কিরণের স্বামী বোঝায় –

“শাস্ত্রে আছে রে কিরণ
মিথ্যা রে ভাবিস না
রাজা হরিশচন্দ্র রাণী বেচে
দিয়াছে গুরু দক্ষিণা
ও কি ও রে

গুরুসেবা করিতে দিতে রে
তোক দিনুরে বন্ধকী
এ হেন দুর্গতি
হইল কিরণ কপালের ফেরে..."

খিসা খন পালাগানগুলির মধ্যে যে পালাটি দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশিত হয়ে চলেছে, তা হল প্রখ্যাত খন পালাকার শ্রীকান্ত সরকার রচিত 'হালুয়া হালুয়ানি পালা'। 'হালুয়া' অর্থে যে হাল বয় অর্থাৎ কৃষক এবং 'হালুয়ানি' অর্থে কৃষকের স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। তাঁদের দৈনন্দিন ব্যথা-বেদনার ইতিবৃত্তই এই খন পালাগানে ফুটে উঠেছে। খিসাখন পালাগানের রূপ ও রসকে বোঝার অন্যতম উপকরণ 'হালুয়া - হালুয়ানি পালা'। পালার শুরুতে দেখানো হয়েছে একজন কৃষক তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে (কথ্যভাষায় 'নওদারি') আদর করে ডেকে বলছে সে হাল বাইতে যাচ্ছে ভুরভুষিডাঙ্গার মাঠে। অন্য কেউ থাকলে তাকেই সে পাঠাতো, সে নববধূর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েই থাকতে পারতো; কিন্তু তার উপায় নেই। হতাশ হয়ে সে তার স্ত্রীকে বলে—

"উঠেক উঠেক বাই মোর নওদারি
হাল বাহিবা যাছুরে মুই ভুরভুষাডাঙ্গি...
ও কি মরি রে
ঘরত্ নাইরে ব্যাটা ছুয়া
কে যাইবে ওরে হালখান ধরিয়া..."

গ্রাম বাংলার কৃষকদের জীবনযাত্রা এবং কৃষকদের দারিদ্র্য ও যন্ত্রণার কথা এই পালাতে প্রকাশিত হয়েছে। কৃষকেরা কীরকম করে হাল বায়, কীরকম করে পান্তা খায়, কীভাবে চৈত্রমাসের কাঠফাটা রোদে ও প্রবল গরমে কৃষকদের স্ত্রীরা মাঠে গিয়ে কৃষকদের পান্তা ও একঘটি জল দিয়ে আসে—সেইসকল বাস্তব চিত্রের নিদর্শন রয়েছে এই পালায়। ক্ষেতের কাজ করবার পর কৃষকের কাছে সেরা খাবার হল নুন ও লঙ্কা সহযোগে পান্তা ভাত। কিন্তু প্রবল দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে তাও জোটানো ভার। তখন কৃষকের স্ত্রী চালের গুঁড়ো এবং 'কুই' (কুয়ো) থেকে আধঘটি জল নিয়ে চৈত্রের কাঠফাটা রোদে কৃষককে খাবার দিতে যায়, কিন্তু খিদের মুখেও সেই খাবারও কৃষকের গলা দিয়ে নামতে চায় না। খেতে না পারা কৃষকের শরীরে ধীরে ধীরে বাসা বাঁধতে থাকে নানা ধরনের রোগ এবং অসুস্থ, অশক্ত স্বামীকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়া কৃষকের স্ত্রী বিলাপ করতে থাকে। কৃষকও তার শরীরের অবস্থা বুঝে তার গ্রাম সুবাদে 'আজু'-র (দাদুর) কাছে দুঃখপ্রকাশ করে। সে অনুভব করে তার আয়ু ফুরিয়ে আসছে, তাই সে পেট ভরে খেতে চায় লাউ, কুমড়ো আর 'নাহু' শাক। নবপরিণীতা স্ত্রীকে কোন সুখই দিতে না পারার যন্ত্রণা কৃষককে বিদ্ধ করে, স্ত্রীর জন্য তার দুর্ভাবনা হয়। সে আজুর কাছে মিনতি করে তার নওদারির দেখাশোনা করার জন্য। শেষ পর্যন্ত আজুর হাতে স্ত্রীকে তুলে দিয়ে কৃষক মৃত্যুবরণ করে ও পালাটি শেষ হয় এক করুণ সুরের মধ্যে দিয়ে। এই পালায় ব্যবহৃত হয় গরুর মুখোশ, যা এই পালাকে অন্য মাত্রা দেয়। এই পালার অন্যতম দুজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী ছিলেন রমণীকান্ত সরকার ও তাঁর স্ত্রী আকুলবালা সরকার[৬]।

খিসা খন পালাগানের অপর একটি মূল বিষয় হল সমাজে প্রচলিত নানা অনৈতিক কার্যকলাপ, দুর্নীতি প্রভৃতি বিষয়কে তুলে ধরা। সেই কারণেই কোনও পরিবারের ভাসুর ও ভ্রাতৃবধূর অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে তৈরি হয়েছে 'ভাসুর-ভাউসানি পালা', যে পালাগানে ভ্রাতৃবধূর প্রতি ভাসুরের আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। 'আশাসোরী' খন পালাগানে দেখা যায়, পূর্বে কীভাবে ভণ্ড গোঁসাইরা ধর্মের দোহাই দিয়ে কিশোরী মেয়েদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতেন। সমাজে প্রচলিত নানা ধরনের দুর্নীতি, কুকর্ম ইত্যাদি বিষয়কে নিয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বনেও খিসা খন পালাগান পরিবেশিত হয়। যে সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সমাজে বিভিন্ন অনৈতিক কাজ করতেন, সেগুলিকেই খিসা খন পালাগানগুলিতে দেখানো হয়। তবে আইনি জটিলতা ও থানা-পুলিসের সমস্যা এড়ানোর জন্য দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নাম সরাসরি পালায় উল্লিখিত হয় না। এই ধরনের কিছু খিসা খন পালা হল-নিমাইচন্দ্র সরকার রচিত 'মাস্টার মার্ডার পালা' (কুমারগঞ্জ উচ্চ

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজনৈতিক কারণে খুন হলে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই পালা রচিত হয়), মাধাই মহন্ত রচিত 'মিনতিসোরী ও পুলিস মার্ডার পালা' (মূল বিষয়বস্তু রাতের অন্ধকারে নারীপাচার) ইত্যাদি। 'মিনতিসোরী ও পুলিস মার্ডার পালা' লেখার জন্য ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে প্রবীণ খন পালাকার মাধাই মহন্তকে গ্রেপ্তার করেন দারোগা চণ্ডী বসু, বিচারে ৩৬ ঘণ্টা কারাবাসও করতে হয় তাঁকে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়েও বর্তমানে খন পালাগান লিখিত হচ্ছে। পূর্বে পৌরাণিক ও ধর্মীয় নানা বিষয় নিয়ে শাস্ত্রীয় খন পালাগান হলেও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে খন পালাগান বিশেষ লেখা হয়নি। ঐতিহাসিক বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে খন পালাগান লেখা নিঃসন্দেহে দিনাজপুরের মানুষদের আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মেলামেশা করারই ফসল। নিজেদের ইতিহাসকে জানতে চাওয়ার আগ্রহ থেকেই এই ধরনের খন পালাগান বর্তমানে রচিত হচ্ছে। প্রখ্যাত খন পালাকার খুশী সরকার ঐতিহাসিক নানা বিষয়ে খন পালাগান রচনা করেছেন। 'তেভাগা খন' এই ধরনের একটি খন পালাগান এবং প্রখ্যাত খন পালাকার খুশী সরকারের এক অনবদ্য সৃষ্টি। 'তেভাগা খন' পালার মূল পটভূমি অত্যাচারী ইংরেজ সরকার ও তাদের দালাল দেশীয় জমিদারদের জুলুমের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা উত্তরবঙ্গের ভাগচাষীদের তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কুশমণ্ডিই ছিল তেভাগা আন্দোলনের পীঠস্থান এবং এই আন্দোলনের জ্বলন্ত চিত্র এই পালাগানে তুলে ধরা হয়েছে। এই খন পালায় অত্যাচারী জমিদার খাণ্ডিয়া মহাজনের বিরুদ্ধে ভাগচাষীরা কীভাবে আন্দোলনে গর্জে ওঠে এবং উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ পাবে চাষী আর একভাগ পাবে মালিক—এই দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে, তার বিবরণ রয়েছে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী নেতা তথা সমাজ-সংস্কারক পঞ্চানন বর্মার জীবনকাহিনী অনুসরণে খুশী সরকার রচনা করেছেন অপর একটি খন পালাগান 'খন ঠাকুর পঞ্চানন', যা নিঃসন্দেহে খন পালাগানের ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আধুনিক সময়ে যান্ত্রিক সভ্যতার ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। যন্ত্র ও বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আজকের যুগে একটি দিনও কল্পনা করা যায় না। আর এই যান্ত্রিক সভ্যতা নগর ও শহরের গণ্ডি অতিক্রম করে পাড়ি দিয়েছে গ্রামগুলিতেও। বর্তমান সময়ের খন পালাগানগুলিতে আধুনিকতার ছাপ লক্ষ করা যায়। সেই কারণে বর্তমানে খন পালাগানগুলির নায়িকাদের কেউ আর রক্তমাংসের নায়িকা নয়, বরং কখনও কারেন্ট ('কারেন্টসোরী'), কখনও মোবাইল ('মোবাইলসোরী') কখনও হ্যাজাক ('হ্যাজাকসোরী'), কখনও বা হেলমেট ('হেলমেটসোরী') প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গগুলিকে নায়িকা হিসাবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। কখনও আবার খল পালাগানের নায়ক হয়ে উঠছে অটো। অটোরিক্সা ভ্যানরিক্সার থেকে দ্রুতগতির যান এবং যাত্রীরা কোথাও দ্রুত যাওয়ার প্রয়োজন হলে অটোকেই প্রাধান্য দেয়। ফলে আগেকার দিনের মতো ভ্যানরিক্সাকে কেউ কদর করে না। এই নিয়েও বর্তমান সময়ে রচিত হয়েছে খন পালাগান 'ভ্যানরিক্সার ভালোবাসা/অটো করলে সর্বনাশা'। কৌতুকের ছলে রচিত এই খন পালাগানটিও দর্শকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। সমাজের উন্নতিসাধনে বিদ্যুতের অবদান অনস্বীকার্য্য, বিদ্যুতের সাহায্যেই আলো জ্বলে, পাখা চলে, টিভি চলে। এছাড়াও মানুষের নানারকমের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ সম্ভবপর হয় বিদ্যুতের সাহায্যেই। আধুনিক যুগের এই অপরিহার্য অঙ্গ বিদ্যুতকেই বর্তমান সময়ের খন পালাগানের বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন মাধাই মহন্ত, লিখেছিলেন 'কারেন্টসোরী' নামক খন পালাগান। এছাড়াও তিনি লিখেছিলেন 'পাম্পিংসোরী' নামক একটি খন পালাগান, যার নায়িকা একটি জলের পাম্প। এগুলি ছাড়াও আধুনিক জীবনের নানা বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে খন পালাগান। বর্তমান সময়ে রাস্তায় বেরোনোর জন্য মোটরবাইকে চড়তে হলে হেলমেট কতটা প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ—সেই বার্তাটি দেবার জন্য রচিত হয়েছে খন পালাগান 'হেলমেটসোরী', যে পালার নায়িকা হয়ে উঠেছে হেলমেট। আধুনিক জীবনের অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ মোবাইল ফোনও হয়ে উঠেছে এই সময়ের খন পালাগানের বিষয়বস্তু। মাধাই মহন্ত রচনা করেছিলেন খন পালা 'সিম-চিপসোরীর কথা', যেখানে মোবাইলের সিম ও চিপ যেন দুই নারী। দুই নারীর মধ্যে যেমন কথা চালাচালি হয়, তেমনি সিম কথা চালাচালি করে। আরেক নারী চিপ গান শোনায়, সান্ত্বনা দেয়। মোবাইল সেটটি হল সিম আর চিপের স্বামী। মোবাইল সেটটির মালিক হল নিঃসন্তান ক্রেতা, মোবাইলটিকে সে বুক পকেটে আগলে রাখে। কিন্তু মোবাইল সেটটি মালিকের কথায় চলে না, চলে চার্জারের কথায়। চার্জার যেন গ্রামের দেউনিয়া।

আর এভাবেই আধুনিক যুগের দর্শককে আকৃষ্ট করবার জন্য বিষয়ের অভিনবত্বে ও মাত্রার নিরিখে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বর্তমান সময়ে আধুনিক হয়ে উঠছে খন পালাগান, যা বাংলার চিরন্তন গ্রামীণ লোকনাট্যকে দান করেছে অনন্যতা।

শেষের কথা :

খন পালাগান প্রকৃত অর্থে এক ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ লোকনাট্য। এটি উত্তরবঙ্গের এক চিরায়ত লোকসাংস্কৃতিক আঙ্গিক। মানুষের সমাজ সভ্যতার বিকাশে যে কৃষিসম্পর্ক, তার উর্বরতা শক্তি এবং তাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত যে আচার-অনুষ্ঠান, সেগুলির মধ্যে কিছু আনন্দঘন পরিবেশ খুঁজে পাওয়া যায়। এই পরিবেশগুলির মধ্যে নাট্যগুণ থাকে, যেগুলিকে কৃষিজীবী মানুষেরা লোকনাট্য রূপে পরিবেশন করেন। খন পালাগান এ ধরনেরই এক লোকসাংস্কৃতিক সংরূপ। খন পালাগানে একদিকে যেমন উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের হৃদয়ের আকুতি ফুটে ওঠে, তেমনি তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াই ও সংগ্রামের কাহিনী, আচার, রীতিনীতি, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ও এই পালাগানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কৃষিভিত্তিক সমাজের 'ফার্টিলিটি কাল্ট' থেকে লোকায়ত সমাজে উৎসব-আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রয়োগ হয়ে থাকে। সেই সব আচারগত কার্য করতে গিয়েই রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষদের ভাবনায় একটি নাট্যের রূপ চলে আসে, যা পরিণতি পায় খন পালাগানে। রাজবংশী সমাজের খণ্ড খণ্ড জীবনের এক-একটি কোলাজই হল খন পালাগান। গবেষক ড. সমিত কুমার সাহার মতে, গ্রামীণ লোকায়ত মূল্যবোধের বিচিত্র বহমানতায় খন পালাগানের উদ্ভব[৮]। এককথায়, দিনাজপুরের রাজবংশী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও লোকসংস্কৃতির আলেখ্য এই খন পালাগান। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে, উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ লোকনাট্য খন পালাগান বাংলা ও বাঙালীর প্রাণের সম্পদ।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, পুষ্পজিৎ, 'গ্রামীণ লোকনাটক : খন', 'বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক', শ্রী সনৎকুমার মিত্র (সম্পা.), পৃ. ১৭৮-১৯০
২. মল্লিক, শ্রী হর্ষ, 'খন-১', 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', পৃ. ১১৪ - ১১৫
৩. সরকার, খুশী, 'খন উপন্যাস - উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি' (হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি)
৪. মজুমদার, ডঃ শিশিরকুমার, 'খন-২' 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', পৃ. ১১৫ - ১১৭
৫. বিশ্বাস, ডঃ মন্টু, 'খন-৩', 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', পৃ. ১১৭ - ১১৮
৬. তালুকদার, গোবিন্দ, 'দিনাজপুরের লোকদর্পণ খন', 'গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ', অধ্যায়-'দাগ' পত্রিকা, পৃ. ১২৫ - ১২৯
৭. চন্দ, সুনীল, 'লোকনাট্য খন ও শিল্পী মাধাই মহন্ত', 'গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ', অধ্যায়-'দাগ' পত্রিকা, পৃ. ১৩১ - ১৩২
৮. তথ্যচিত্র : 'খন খোঁজার পালা', (KHON : THE SURVIVING SPIRIT OF DESHIYA & POLIYA), চিত্রনাট্য ও নির্দেশনা-অভীক দাস। লিঙ্ক - https://youtu.be/swjePUVidhI

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. শ্রী অনিল পাহান ও শ্রীমতী বুলবুলি সরকার (নাট্যশিল্পী, উত্তরকন্যা খন নাট্য সংস্থা, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ)।
২. শ্রী গোবিন্দ তালুকদার, খন গবেষক, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ।
৩. শ্রী সৌরভ রায়, খন গবেষক ও খনশিল্পী, ঊষাভানু নাট্য সংস্থা, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ।
৪. শ্রী খুশী সরকার, খন পালাকার, কুশমণ্ডি, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ।